নির্বাচনী ইশতেহার-২০০১

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

পরিচ্ছেদ-১

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা- উত্তর বাংলাদেশ

১.১ স্বধীনতার প্রেক্ষাপট, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জিয়াউর রহমান:

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান হলেও এদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। পাকিস্তানী আমলে শুরু হয় নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষনের এক নতুন অধ্যায়। প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিরোধের আন্দোলন।১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর এলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বরের মতো ঘৃণ্য হামলা চালায় তখন এর আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে সবোর্স্তরের জনগণ। সেই সমস্যা একটি নেতৃত্ব, একটি আহ্বানের বড়ই প্রয়োজন ছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভেষে এল একটি কণ্ঠ:'' আমি মেজর জিয়া বলছি'' এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা এল বাংলাদেশের স্বাধীনতার, আহ্বান এল সর্বশক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার। এই আহ্বানে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ-কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবি, সৈনিকসহ আপামর জনসাধারন– ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার কিয়দংশে মেজর জিয়া সংগঠিত করেন সংগঠিত করেন মুক্তিপাগল সকল শ্রেণীর মানুষকে এবং পরবর্তীতে বিখ্যাত 'জেড ফোর্সের' অধিনায়ক হিসেবে সিক্রয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেনসেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে অজির্ত হল সবুজ জমিনে ওপর রক্তলাল সূর্যখচিত পতাকাসমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ– আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। লাখো শহীদের পবিত্র রক্ত আর হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অজির্ত হল এদেশের স্বাধীনতা। গণতন্ত্র এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, শোষন বঞ্চনার অবসান ঘটবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব– এই ছিল সেদিনের স্বপ্ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

লাখো শহীদের পবিত্র রক্ত আর হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অজির্ত হল এদেশের স্বাধীনতা। গণতন্ত্র এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, শোষন বঞ্চনার অবসান ঘটবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব–

১.২ স্বাধীনতা পরবর্তী দুঃশাসন:

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনা, দেশবাসীর সেদিনের স্বপ্ন কিছু দিনের মধ্যেই ধুলিসাৎ হয়ে গেল। সীমাহীন দুর্নীতি, অনাচার, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা আর অপশাসনের ফলে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে দেশের ভাগ্যে জোটে 'তলাহীন ঝুড়ির' মতো লজ্জাজনক খেতাব। হত্যা, অপহরণ, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হল। ক্ষুব্ধ জনগণকে দমন করার জন্য রক্ষীবাহিনী, সেচ্ছাসেবক বাহিনী, লালবাহিনীসহ নানা দলীয় বাহিনী গঠন করা হল। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষক দেশপ্রেমিক স্বতস্ত্র বাহিনীকে উপেক্ষা ও অবজেলা করা হল, প্রতিষ্ঠা করা হল সমান্তরাল নতুন বাহিনী। এই সব দলীয় বাহিনীর হাতে সিরাজ শিকদারসহ প্রায় ৩০ হাজার রাজনৈতিক নেতা- কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারাল। অবাধ চোরাচালানী, মজুদদারি, দূর্নীতি ও অযোগ্য শাসনের ফলে দেশে সৃষ্টি হল শতাব্দীর ভয়াবহতম মানবসৃষ্ট দুভিক্ষ। রাজধানী ঢাকার রাস্তাঘাটে তখন অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত হাজার হাজার বিবস্ত্র নরকঙ্কাল।

এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী যখন প্রতিবাদে মুখর, ঠিক সেই সময় ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবিধান পরিবর্তন করে মহান স্বাধীনতার ফসল গণতন্ত্রকে হত্যা রকরা হল, প্রতিষ্ঠা করা হল'বাকশাল' অর্থাৎ এক ব্যাক্তির শাসন। মাত্র

৪টি সংবাদপত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হল। সরকারি কর্মচারি, পুলিশ, বিডিঅআর এবং স্বতন্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে বাকশালের সদস্য করে নিয়ে আসা হল দলীয় রাজনীতিতে। বিচারপতিদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সরকারের নির্বাহী প্রধান রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে হরণ করা হল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

১.৩ আওয়ামী লীগের একাংশ কর্তৃক জারিকৃত সামরিক আইন ও সিপাহী-জনতার বিপ্লব:

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ক্ষমতার লড়াই যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ও তার মন্ত্রিসভায় জোষ্ঠ মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ঐ মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যসহ সরকার গঠন করেন। আওয়ামী লীগের এই বিদ্রোহী অংশই দেশে প্রথমবারের মত সামরিক আইন জারি করে। অল্পদিন পরে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে আওয়ামী লীগ সমর্থক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকারকে উৎখাত করেন। সেই সঙ্গে স্বগ্রহে অন্তরীন করেন স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম-কে। এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশপ্রেমিক সিপাহী-জনতার এক অভুতপূর্ব বিপ্লব সংগঠিত হয়। সিপাহী-জনতা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকে যার ওপরে পরবর্তিতে অর্পিত হয় রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব।

এই ছিল সেদিনের স্বপ্ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু আওয়ামী লীগের রক্ষক্ষয়ী ক্ষমতার লড়াইয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যখন বিপন্ন তখন ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সংগঠিত হয় দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতার এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। সিপাহী-জনতা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকে যার ওপরে পরবর্তিতে অর্পিত হয় রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব। একদলীয় বাকশাল প্রথার স্থলে বহুদলীয় বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

১.৪ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অভ্যুদয়, আদর্শ ও উদ্দেশ্য:

স্বাধীনতার পরবর্তি সময়ে যখন একনায়কতনত্র দেশে স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মপরায়ণতার সমাধি রচনা করতে উদ্যত হয়েছিল তখন জিয়াউর রহমানের সামনে প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেখা দেয় ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সুসংহত করা এবং একদলীয় ও একনায়কীয় বাকশাল প্রথার স্থলে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক এই দলের মূল চালিকা শক্তি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠির মানুষকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত করে দেশ গড়ার সংগ্রামে পরিচালিত করাই হচ্ছে বিএনপির লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সকল মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি ‘তলাহীর ঝুড়ি’ থেকে আত্মমর্যাদাশীল উন্নত দেশে পরিণত করার আদশের্ উদ্বুদ্ধ হয়ে বিএনপি তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সস্তা, চটুল, ভাওতাবাজি ও ধ্বংসের রাজনীতির স্থলে এদেশে উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতির প্রবর্তন করে বিএনপি।

১.৫ শহীদ জিয়ার আমলে–দেশের স্বর্ণযুগ (নভেম্বর ১৯৭৫-মে ১৯৮১):

জিয়াউর রহমান দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই দেশে আইনের শাসন পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ গড়ার এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। নিজ চোখে তিনি মানুষের সমস্যা দেখেছেন, দেশের সমস্যা অনুধাবন করেছেন। দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিয়েছেন। জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দেশবাসী তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়া গড়ে তুলেছিলেন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য। উন্নয়ন কার্যক্রমে সঞ্চারিত হয়েছিল দূর্বার গতি। সন্ত্রাসের করাল ছায়া থেকে মুক্ত স্বদেশে প্রথমবারের মত বইল শান্তির সুবাতাস, অস্থিতিশীলতা থেকে উত্তোরণ হলো স্থিতিশীলতায়। অবসান হল রাজনৈতিক শূণ্যতার। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রায় ১০ হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। জরুরী

অবস্থা প্রত্যাহার করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জিয়া প্রবর্তিত উন্নয়নের রাজনীতির কতিপয় সাফল্য:

সকল দলের অঃশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান; জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি; বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া; দেশে কৃষি বিপ্লব, গণশিক্ষা বিপ্লব ও শিল্প উৎপাদনে বিপ্লব; সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লেক্ষ্য স্বেচ্ছাশ্রম ও সরকারী সহায়তায়র সমন্বয় ঘটিয়ে ১৪০০ খাল খনন ও পুনর্খনন; গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করে অতি অল্প সময়ে ৪০ লক্ষ মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দান; গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রদান ও গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) গঠন; গ্রামাঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বন্ধ করা; হাজার হাজার মাইল রাস্তা-ঘাট নির্মাণ; ২৭৫০০ পল্লী চিকিৎসক নিয়োগ কের গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা স্থাপনের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত দূরীকরণ; কলকারখানায় তিন শিফট চালু করে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশকে খাদ্য রপ্তআনীর পর্যায়ে উন্নীতকরণ; যুব উন্নয়ন মন্ত্রাণালয় ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব ও নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ; ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্টা করে সকল মানুষের স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃইষ্ট করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন; তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামের জনগণকে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করণ এবং সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্ব সৃষ্টি করার লেক্ষ্য গ্রাম সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন; জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আসনলাভ; তিন সদস্যবিশিষ্ট আল-কুদস কমিটিতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি; দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে 'সার্ক' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ; বেসরকারিখাত ও উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ; জনশক্তি রপ্তানি, তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পসহ সকল অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীর দ্বার উন্মোচন; শিল্পখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ।

১৯৮০-এর দশকের গণআন্দোলনের আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর যখন সরকার গঠন করেন তখন রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে আওয়ামী লীগ ১৭৩ দিন হরতাল পালনসহ নানাভাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে তারা ক্রমাগত অন্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার অগ্রাহ্য ও ক্ষুন্ন করেছে।

১.৬ সরকার পরিচালনায় বি এন পি'র পাঁচ বছর (১৯৯১-১৯৯৬):

রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের সাফল্য, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের দ্রুত উন্নতি এবং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশী-বিদেশী একদল চক্রান্তকারী বরদাশত করতে পারে নি। সেই সব চক্রান্তকারীর হাতে ১৯৮১ সালে ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস পর এই নির্বাচিত সরকারকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে লেঃ জেঃ এইচ, এম, এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করেন। গণতন্ত্রের এই সংকটকালে বাঙলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী বেগম খালেদা জিয়াকে দলীয় প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় পৌনে নয় বছর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতাসীন থাকাকালে গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারের লক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়া তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপি বিরামহীন গণআন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি ছিলেন এই গণআন্দোলনের অবিসংবাদিত আপোষহীন নেত্রী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে এরশাদের সাথে গোপন আঁতাত করে তার অবৈধ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নীল নকশার সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই নয় বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান নি। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অবশেষে ১৯৯০ মালের ডিসেম্বর মাসে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীতে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিপুলভাবে জয়লাভ করে এবং বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীরূপে সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের নির্বাচন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে দেশে-বিদেশে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

বেগম খালেদা জিয়া যখন সরকার গঠন করে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণতন্ত্র সুসংহত করার দায়িত্ব লাভ করেন, রাস্ট্রীয় তহবিল তখন ছিল প্রায় শূন্য। জাতীয় উন্নয়ন বাজেট ছিল শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল চরম বিশৃঙ্খলা। প্রশাসনের সর্বস্তরে ছিল সীমাহীন দূনীতি ও অব্যবস্থা।

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএনপি সরকারকে বিরাজমান এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃংঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে চাঙ্গা করার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে। জনস্বার্থে এসব দায়িত্ব পালনে দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নিকট থেকে যেরূপ সহযোগীতা পাওয়া স্বাভাবিক ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায় নি। বরঞ্চ রাজনৈতিক বিরোধীতার নামে আওয়ামী লীগ ১৭৩ দিন হরতাল পালনসহ নানাভাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে তারা ক্রমাগত অন্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার অগ্রাহ্য ও ক্ষুন্ন করেছে।

১৯৯১ সালে রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্ব বিএনপি'র ওপর অর্পিত হবার পর বৈদেশিক সাহায্য ও নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করা হয়। সে নীতি সফল হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্তির প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৮শ ২২ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪শ ৫০ কোটি টাকায়। বার্ষিক উন্নয়ন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১৯৯০-৯১ সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭শ ৯১ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা ৪ হাজার ৮শ ৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। ''কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী'', ভিজিপি, জিআর, টিআর, কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে ১ হাজার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঐ সময় নগর ও গ্রামাঞ্চলে সড়ক ও সেতু নির্মাণে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। এইসব উন্নয়নমূলক কাজে প্রতি বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৯০-১৯৯১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ১শ ২৬ কোটা টাকা।১৯৯৪-৯৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার ১শ ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ এ বরাদ্দ ৮২ শতাঙশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ সালে দেশের রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬,০২৭ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৪৫২ কোটি টাকায়। নানা বাধা-বিপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ বন্যা, খরা, সাইক্লোন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে উন্নয়ন প্রয়াস বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও অপ্রত্যাশিত বাধা-বিপত্তি এবং পরিকল্পিত নাশকতামূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপ সত্ত্বেও বিএনপি আমলের ৫ বছরে অর্জিত সাফল্য দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান বিএনপি সরকারের আমলের দু'টি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে উন্নতি সাধন করা হয় বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও টেলিফোন ব্যবস্থার। দেশে প্রথমবারের মত বিদ্যুৎ, গ্যাস, শিল্প, পরিবহন ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেয়া হয়।

এই সাফল্যগুলির মধ্যো উল্লেখযোগ্য হল:

আইন-শৃঙ্খলা:

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন করা হয়। দেশে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং জনজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

সাঃবিধানিক ও রাজনৈতিক:

সংসদীয় পদ্ধতি:

জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। দেশ পরিচালনায় বিরোধী দলের অঙশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠন করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা:

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

মেয়র নির্বাচন:

সকল পৌর কর্পোরেশনে প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং দেশে প্রথমবারের মত প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ভোটার পরিচয়পত্র:

নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক ভোটারকে পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সংসদে বিল পাশ এবং এজন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ:

সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। এই সময়ে দেশে প্রথমবারের মত অনেকগুলি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিবিসি, সিএনএন ও স্যাটেলাইট টিভি অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়। চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টিভি স্টেশন এবং ঝিনাইদহে টিভি রীলে স্টেশন স্থাপন করা হয়। রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারে রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক:

উন্নয়ন বাজেট:

১৯৮৯-৯০ সালের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বিদেশী ঋণ নির্ভর ৫ হাজার ১ শ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা হয়, যার ৪৩ ভাগ অর্থ নিজস্ব সম্পদ থেক যোগান দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বিএনপি ক্ষমতা লাভের পূর্বে উন্নয়ন বাজেটগুলিতে নিজস্ব সম্পদের যোগান ছিল শতকরা মাত্র ২ থেক ৩ ভাগ।

মুদ্রাস্ফীতি:

মুদ্রাস্ফীতির গড় ৩% এর নীচে রাখা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও টাকার মান:

৩০.০৬.৯৫ তারিখে বিএনপি সরকারের আমলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩,০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একটি সর্বকালীন রেকর্ড। ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বিএনপি সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বে বিরোধীদল কর্তৃক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একটানা নানাবিধ বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এই মজুতের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ হাজার ৩ শ মিলিয়ন ডলারের মত। ১৯৯৫-৯৬ সালে টাকার গড় বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার= ৪০.২০ টাকা।

শিল্প-বাণিজ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ:

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে ও বিদ্যুৎ, টেলিফোন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি মাধন করে কৃষি, শিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে দেশে প্রথমবারের মত ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেয়া হয়।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত এবং নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল নতুন শিল্পকে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য 'ট্যাক্স হলিডে' মঞ্জুর করা হয়।

কৃষি, সমবায়, কৃষক ও তাঁতী:

কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়। এ বাবদ মোট কৃষিঋণ মওকুফের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা।

তাঁতী ও সমবায়ীদের ঋণের সুদ ও দণ্ডসুদ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কিন্তু পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার আমলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি চালু করা হয়। কৃষি ও সেচকাজের সুবিধার্থে সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, সেচপাম্পসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস করে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা হয়। নদী ভাঙ্গনের পর ৩০ বছরের মধ্যে লুপ্ত জমি জেগে উঠলে তা জমির মালিককে ফেরত দেয়ার আইন প্রণয়ন করা হয়।

৩৩০টি থানায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু ও ১৫ হাজার গ্রাম বিদ্যুতায়িত, যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু এবং প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন, তিন লক্ষ নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান, দেশে সর্বপ্রথম কার্ড ফোন, সেলুলার ফোন, গ্রামীণ আইএসডি ফোন চালু, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি কর্মসূচী, 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী, প্রতিবছর শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট

বিদ্যুৎ:

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে লোডশেডিং পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা হয়।

শিল্প-কলকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ৩৩০টি থানায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু করে ১৫ হাজার গ্রাম বিদ্যুতায়িত করা হয়। ৫৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যথা: বাঘাবাড়ি (৭১ মে.ও.), চট্টগ্রাম রাউজান-১ (২১০ মে.ও.), ঘোড়াশাল (২১০ মে.ও.) এবং সিলেট কম্বাইণ্ড সাইকেল (৯০ মে.ও.) চালু করা হয়। এছাড়া ৭৯৯ মে. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৫টি নতুন কেন্দ্রের কাজ শুরু করা হয় এবং আরো ১০২০ মে. ও. উৎপাদনের জন্য ৪টি কেন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু ও মৎস্যচাষ:

সহজ শর্তে ঋণ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে হাঁস মুরগী, মৎস্য ও গবাদি পশুর খামার প্রতিষ্ঠার বিপুল সুযোগ সুষ্টি করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। দেশে সরকারি সহায়তায় গবাদিপশু পালন উৎসাহিত হওয়ায় বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানির পরিমাণ টাকার অংকে ছয়শত কোটি থেকে প্রায় একশত কোটিতে নেমে আসে। উন্মুক্ত জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করে প্রকৃত জেলে ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের মৎস আহরণের অবাধ সুবিধা প্রদান করা হয়। 'জাল যার জলা তার' নীতি অনুসরণ করে প্রকৃত মৎসজীবিদেরকে জলমহাল ইজারা দেয়া হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা:

প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু এবং প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন করা হয়। মেঘনা, গোমতী, মহানন্দা, আত্রাই, শেওলা, ধলেশ্বরী-১ এবং ধলেশ্বরী-২ প্রভৃতি সেতুসহ সারা দেশে তিন শতাধিক ছোট-বড় সেতু ও হাজার হাজার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও পাকাকরণ হয়, যার মধ্যে ছিল জেলা সদরের সঙ্গে আর্ন্তজাতিক মানের কয়েক হাজার মাইল জনপথ এবং প্রত্যেকটি উপজেলা সদরের সঙ্গে সংযোগসাধনকারী রাস্তা। ২য় বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। রূপসা সেতু, শীতলক্ষা সেতু ও ভৈরব বাজারে মেঘনা সেতু নিমার্ণের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। আধুনিক ইঞ্জিন ও বগি আমদানি এবং রেল লাইনসমূহের সংস্কার করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়। চট্টগ্রামে দেশের আধুনিকতম ও বৃহদায়তনের রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করা হয়।

টেলিযোগাযোগ:

পাঁচ বছরে সারা দেশে তিন লক্ষ নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে দু'হাজার সালের মধ্যে ৮ লক্ষ নতুন টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

দেশে সর্বপ্রথম কার্ড ফোন, সেলুলার ফোন, গ্রামীণ আই এস ডি ফোন চালু করা হয়।

শিক্ষা:

আইন প্রণয়ন করে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে সর্বপ্রথম উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করা হয়। দরিদ্র শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর প্রচলন করা হয়। হাজার হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়। দেশে সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু সঙখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরু কিছু সঙখ্যক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সম্বর্তন উৎসব চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশনজট দূর করা হয়। গণশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের বেতনের অনুদান ৮০ ভাগে বৃদ্ধি ও তাদেরকে টাইমস্কেল দেয়া হয়। প্রতিবছর শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

'দুঃস্থ মহিলাদের ঋণদান' কর্মসূচী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য পে-কমিশন গঠন ও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন করে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা একসঙ্গে প্রদান, অবসর গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে পেনশন পাওয়া এবং প্রথমবারের মত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধি সন্তানদেরও আজীবন পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা, সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়স সীমা ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছরে উন্নীতকরণ

স্বাস্থ্য:

বৃহত্তর জেলা সদরে ১০০ শয্যার হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় এবং ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলির শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। বহু সংখ্যক হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। এক বছরের কম বয়সী শতকরা ৮৫ ভাগ শিশুকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। শতকরা ৯০ ভাগ জনগণের জন্য ইবশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

দুঃস্থ মহিলা:

দু:স্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে 'দুস্থ মহিলাদের ঋণদান' কর্মসূচী চালু করা হয়।

খনিজ সম্পদ:

বড়পুকুরিয়ার কয়লা এবং মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা উত্তোলন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। ভোলা ও বঙ্গোগোপসাগরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র ও দিনাজপুরে কয়লা ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতি বছর দু'টি করে অনুসন্ধান কুপ খননের উদ্যেগ নেয়া হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়ন:

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত আইনসমূহ দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশব্যাপি বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন শুরু করা হয়। সমুদ্র– উপকূল অঞ্চলে বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকূলীয় বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। সহজ শতের্ ঋণ প্রদান করে বেকার নারী ও পুরুষদের জন্য বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা:

১৯৯১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্নিঝড় এবং পরবর্তীতে বন্যা ও খরা সফলভাবে মোকাবেলা করে মুলত বিদেশ থেকে সাহায্য না নিয়ে সঠিক পূনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপকুলীয় এলঅকা এক হাজারের বেশী 'বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টার' নির্মাণ করা হয়।

ব্যাংক ও বীমা:

বেসরকারী খাতে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ জোরদার করা হয়। ব্যাঙ্কিং খাতের উন্নয়নের জন্য সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, যার ফলে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা বহুলাংশে দূর হয়। আনসার-ভিডিপি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য এ ব্যাঙ্ক থেকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের সহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসন:

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন গঠন ও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন করে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা এক সঙ্গে দেয়া হয়। তদুপরি অতিরিক্ত ১০% বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেনশন জটিলতা নিরসন ও সহজীকরণ করে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেনশন পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রথমবারের মত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদেরো আজীবন পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৩ হাজার বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছরে উন্নীত করা হয়। ফলে বিলম্বে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির কারণে লক্ষ লক্ষ হতাশাক্রান্ত যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হয়। পুলিশ, বিডিআর ও আনছার বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়।

সশস্ত্র বাহিনী:

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীকে সম্প্রসারিত ও সুসজ্জিত করে একটি যুগোপযোগী আধুনিক বাহিনীরূপে গড়ে তোলা হয়।

মজুরি কমিশন:

মজুরি কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের জন্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। এতদ্ব্যতীত, অতিরিক্ত ১০% মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। গার্মেন্টসসহ

ব্যিক্তখাতে ১৭টি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়।

হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্ট ও খৃষ্টান কল্যাণ ট্রাষ্টে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। তফসীলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তফসীলি বৃত্তি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। দূর্গাপূজাসহ অন্যান্য পূজা ও জন্মাষ্টমী প্রর্ভতি অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে রেডিও-টিভিতে প্রচার করা হবে।

ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াদি:

ঢাকায় স্থায়ী হাজি ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার জন্য ৩০০ একরেরও বেশী জমি তবলীগ জামায়াতকে প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলের সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা প্রদাণ করা হয়। মসজিদ, ঈদগাঁ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের কাজে ব্যাপকহারে আর্থিক অনুদান প্রদাণ করা হয়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক:

হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্ট, খ্রীষ্টান কল্যাণ ট্রাষ্টে সরকারি অর্থ বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। তফসীলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তফসীলি বৃত্তি পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। দূর্গা পুজাসহ অন্যান্য পুজা, জন্মাষ্টমী, শ্রী শ্রী হিরচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে রেডিও টিভিতে প্রচার করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধের আইন:

নারী ও শিশু নির্যতন রোধে সবোর্চ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান করে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ড ও বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ:

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ নিমার্ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কোষ্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা:

দেশের জলসীমা পাহারা, নৌ ও সমুদ্রপথে জলদস্যুতা দমন ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কোষ্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তিন বিঘা করিডোর:

ভারতের কাছ থেকে তিন বিঘা করিডোর ব্যবহারের অধিকার অর্জন করা হয়।

ফারাক্কা সমস্যা:

ফারাক্কা সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন এবং গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতকে রাজি করানোর জন্য আর্ন্তজাতিক ফোরামের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করার করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

পাহাড়ী জনগণ ও চাকমা শরনার্থী:

পাহাড়ী জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়। সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরনার্থীদের দেশে ফেরার এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক্ষমতা কুক্ষিগত ও চিরস্থায়ী করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে হত্যা করলেন গণতন্ত্রকে। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে, বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে দেশে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

পরিচ্ছেদ ২

আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ: সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, পারিবারিকিকরণ– এক কথায় সর্বগ্রাসী আওয়ামীকরণ

২.১ ১৯৭২-৭৫ সালের আওয়ামী দুঃশাসনের বেদনাদায়ক স্মৃতি:

স্বাধীনতা উত্তর আওয়ামী দুঃশাসেনর সময় রাষ্ট্রযন্তের সর্বস্তরে আওয়ামীলীগ কেবলমাত্র অযোগ্য, অপদার্থ ও দূর্নীতিবাজ দলীয় লোকদের নিয়োজিত করেছিল। ফলে দেশকে ঠেলে দেয়া হয় দ্রুত অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে। ১৯৭৪ সালের মনুষ্যসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তৎকালীর সরকারি হিসেবেই ৩০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে, যদিও ঐ সময়ে ০২.১১.৭৪ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদ শিরোনাম ছিল "দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু"। শুধু অন্ন নয়, বস্ত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ কূলবধু আব্রু রক্ষা করতে হয় অসমর্থ। ঐ সময়ে কুড়িগ্রামের চিলমারীর গ্রামবাংলা বাশত্রীর মাছধরা জাল পিরহিত আলোকচিত্র বিশ্ব বিবেককে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। ঐ দুর্ভিক্ষের সময় শাসকরা কোটি কোটি টাকার চাল, গম, কাপড় আত্মসাৎ করে মানুষের ঘৃণ্য ও কুখ্যাতি অর্জন করে।

সম্পূর্ণ নিজেদের ক্যাডার নিয়ে আওয়ামী সরকার গঠন করে রক্ষী বাহিনী। এই বাহিনীকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপি চালিয়েছিল ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। এছাড়া গঠন করা হয়লুটপাটের সেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনী ও নীল বাহিনী। শিল্প– কারখানা পাইকারিভাবে জাতীয় করণ করে সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় নিজেদের অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মীদের। শত শত কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য লুট করা হয়। ধ্বংস করা হয় ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প। বন্ধ হয়ে যায় ছোটবড় অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান

ক্ষমতা কৃক্ষিগত ও চিরস্থায়ী করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে হত্যা করলেন গণতন্ত্রকে। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেন এবং চারটি সংবাদপত্র রেখে বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে দেশে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর মত কালো আইন ও কৃখ্যাত রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯-ও তিনিই জারি করেন। বিচার বিভাগকে করেন নির্বাহী বিভাগের অধীন।

২.২ হাসিনা সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামীকরণের কতিপয় নমুনা:

১। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি:

প্রতিদিন খুন-ধর্ষণ-ছিনতাই-রাহাজানি-চাঁদাবাজি-দখলবাজির মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ছিল আওয়ামী সরকারের আমলে গণমানুষের বড়প্রাপ্তি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজঅ আরেফ, সাংবাদিক মুকুল ও শামসুর রহমান, আইনজীবি হাবিবুর রহমান মন্ডল, আইনজীবি কালিদাস বড়াল, এডভোকেট নুরুল ইসলাম, ব্যবসায়ী শিপু, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রুবেল, কলেজ ছাত্রী বুশরা, ছাত্রদল কর্মী সজল, ব্যবসায়ী তারাজউদ্দিন, আদিবাসি নেতা আলফ্রেড সরেন, যুগ্মসচিব নিকুঞ্জবিহারীসহ সারা দেশের হাজার হাজার মানুষ। মানবাধিকার সংস্থাসমূহের প্রতিবেদনানুযায়ী এ ধরনের হত্যার সংখ্যা বিশ হাজার। আর এসব খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিগত থেকে যেসব আওয়ামী নেতা মাসুষের ঘৃণ্য ও ধিক্কার কুড়িয়েছেন তাদের মধ্যে সাবেক এমপি হাজী মকবুল, সাবেক এমপি হাজী সেলিম, সাবেক এমপি ডাঃ ইকবাল, সাবেক এমপি কামাল মজুমদার ও তার পুত্র জুয়েল, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও তার পুত্র

দীপু চৌধুরী, দখলদারী সন্ত্রাসী পুরত্রদের পিতা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, গফরগাঁওয়ের সাবেক এমপি আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ,ফেনীর ত্রাস সাবেক এমপি জয়নাল হাজারী, ছাতকের সাবেক এমপি 'বোমা' মানিক, নারায়নগঞ্জের সাবেক এমপি শামীম ওসমান, লক্ষীপুরের আবু তাহের, অবৈধ জি-৩ রাইফেলসহ গ্রেপ্তার হওয়া সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিঃ মেশাররফ হোসেনের পুত্র সুমু, ব্যাংক দখলদারী আওয়ামী নেতা আখতারুজ্জামান বাবু প্রমুখদের নাম আজ আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত সন্ত্রাসীদের নামের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত।

আওয়ামী লীগ আমলে নারী নির্যাতন একটি প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দিন মানিক ক্যাম্পাসে ধর্ষণের সেঞ্চুরি করে তা উদযাপন করে।

সাংবাদিকদের ওযর চালানো হয় অত্যাচারের স্টিম রোলার। শামসুর রহমান ও মুকুল হত্যা, টিপুকে পিটিয়ে পঙ্গু করা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের অশ্লীল দম্ভোক্তি 'এই কুত্তার বাচ্চা সাংবাদিককে আমি দেখ নেব', সাবেক সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সাংবাদিকদের দৈহিক নির্যাতনের হুমকি প্রদান, চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ অফিসে সাংবাদিকদের মারপিট ও ভাংচুর এবং পরবর্তীতে দু'জন আওয়ামী মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ও ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন কর্তৃক দুই আসামীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি ঘটনা এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে।

দূনীতির শীর্ষে ছিলেন শেখ হাসিনা, তোফায়েল, মঞ্জু, আমু, মোঃ নাসিম, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ড. ম.খ. আলমগীর, রাশেদ মোশাররফ, মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া, আব্দুল জলিল, ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সাবের হোসেন চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ফায়জুল হক, শেখ হেলাল, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, হাজী সেলিম, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, ডা. এইচ বি এম ইকবাল, মেয়র হানিফ, মেয়র মহিউদ্দিন প্রমূখ।

২। সীমাহীন দূর্নীতি:

আর্ন্তজাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল– এর জরিপে বাংলাদেশকে বর্তমান বিশ্বে ১নং দূর্নীতি পরায়ন দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য দায়ী বাংলাদেশের জনগণ নয়, দায়ী দূর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আওয়ামী সরকার, তার প্রধানমন্ত্রী ও তার নেতা কর্মীরা। আওয়ামী আমলের দূর্নীতির কিছু কিছু নমুনা নীচে তুলে ধরা হল:

সাড়ে সাতশ কোটি টাকা ব্যয়ে সাতটি অচলপ্রায় মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় করে দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার বিপুল পরিমাণ কালো টাকা উপার্জন; নৌ-বাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয়েও বড় রকমের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ; পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের স্মৃতি রক্ষার্থে শেখ হাসিনা কর্তৃক শুধু একটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটেই (১৯৯৯-২০০০) খরচ ৩২০ কোটি টাকারও বেশী; ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় পিতার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত; রাষ্ট্রীয় টাকায় দলীয় জনসভা অনুষ্ঠান; নাতনীর জনসভা উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অর্থে দীর্ঘদিনের জন্য সাঙ্গপাঙ্গসহ শেখ হাসিনার আমেরিকা সফর; হাসিনা সরকারের মন্ত্রী, এমপি, নেতাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকা শহরে সরকারি খাস জমি, দালানকোঠা, পার্ক, লেক ও নদী দখল; দলীয় ব্যক্তি ও আত্মীয়দের নামে বনানী-গুলশানে ৪০টি প্লট বরাদ্দকরণ, নিজস্ব লোকদের নামে শত শত 'ন্যাম' ফ্লাটের মালিকানা প্রদান; ঢাকা ও চট্টগ্রামে দলীয় লোক ও আত্মীয়দের মধ্যে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দকরণ; সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে কোটা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল অংকের ঘুষ গ্রহণ; বেনামিতে চট্টগ্রাম সিমেন্ট ক্লিংকার ফ্যাক্টরীর মালিকানা দখল; টেলিফোন মন্ত্রী হিসেবে মোঃ নাসিম কর্তৃক ৫৮ জেলা সদরে টেলিফোন প্রকল্প থেকে প্রায় ৭শ কোটি টাকা আত্মসাত; মোহাম্মদ নাসিম-এর অবৈধভাবে হেলিকপ্টার ভ্রমণের কারণে ৫ বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকা খেসারত; নাসিমের স্ত্রী ও বান্ধবী ঢাকার পুলিশ কমিশনারের স্ত্রী কর্তৃক ঢাকা মহানগরের ২১টি থানায় ওসি বদলীর জন্য ৪ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ; ব্যাংক প্রতি ৫ কোটি টাকা এবং বীমা কোম্পানী প্রতি দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর অনুমতি প্রদান; সরকারি টাকায় পরিবার-পরিজন ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দূরদেশে দীর্ঘ ব্যক্তিগত সফর ও একের পর এক ডক্টরেট ডিগ্রি ক্রয়; দেশবাসীকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রেখে শেখ হাসিনা কর্তৃক নিজের নিরাপত্তার মিথ্যা অজুহাতে সকল প্রকার অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ কয়েকশ কোটি টাকা মূল্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি নিবাস 'গণভবণ' দখল এবং পদস্থ কর্মকর্তাগণ সমৃদ্ধ বিভিন্ন পদের ১৯৭৫ জনের এসএসএফ বাহিনীর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের জন্য আইন পাশ।

অন্যান্য মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও নেতাদের মধ্যে দুর্নীতিতে শীর্ষে ছিলেন আনোয়ারর হোসেন মঞ্জু, আমির হোসেন আমু, মো: নাসিম, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ড. ম. খা. আলমগীর, রাশেদ মোমাররফ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আব্দুল জলিল, ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সাবের হোসেন চৌধুরী, শেখ ফজলুল কিরম সেলিম, ফায়জুল হক, শেখ হেলাল, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, হাজী সেলিম, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, ডা.এইচ বি এম ইকবাল, মেয়র হানিফ, মেয়র মহিউদ্দিন প্রমুখ।

৩। বিদ্যুৎ:

বিদ্যুৎ খাতে আওয়ামী সরকারের হিমালয়সম ব্যর্থতার কারণে শিল্প-কারখানার উৎপাদন, সেচ যন্ত্রের ব্যবহার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া, হাসপাতাল-অফিস-আদালত ইত্যাদিতে কাজকর্মসহ জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত শেখ হাসিনা যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলতেন তখন দেশবাসীর কাছে তা শোনাত পরিহাসের মত।

৪। প্রশাসনের দলীয়করণ:

আওয়ামীপন্থী অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে বসিয়ে প্রশাসনকে অচল করা হয়। পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হয় দলীয় ক্যাযার বাহিনীর মতো। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিকে জেল-জুলুম, চাকুরিচ্যুতি ও 'ডগ-স্কোয়াড' লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে করা হয় স্তব্ধ। ফায়দা লুটে নেয় শুধু তথাকথিত 'জনতার মঞ্চের' কুখ্যাত আমলা মহিউদ্দিন খান আলমগীল, সফিউর রহমান, রিবউল মোক্তাদির, শেখ হাসিনার ফুপাতো বোনের স্বামী রশিদুল আলম গংরা।

৫। বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ ও চাপ সৃষ্টি:

মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে রাজপথে লাঠিমিছিল, তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে হামলা, জাতীয় সংসদে ও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী কর্তৃক বিচারপতিদের উদ্দেশে অশালীন ভাষায় কটুক্তি এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে রাতের অন্ধকারে বস্তি বসিয়ে আওয়ামী লীগ এক ন্যাক্কারজনক অধ্যায় রচনা করে। সুপ্রীম কোর্ট শেখ হাসিনাকে বিচারকদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের জন্য দই দুইবার কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়।

জনতার মঞ্চের' নেতা আওয়ামী লীগের সেবাদাস সুবিধাবাদী আমলা সফিউর রহমানকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা বিনষ্ট করেছে। আওয়ামী আমলের সকল উপনির্বাচনে সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ, আওয়ামী সন্ত্রাস ও ফলাফল নিয়ে কারচুপি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে বিতর্কিত করে তোলে।

৬। জাতীয় সংসদকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণতকরণ:

বিরোধী দলকে কথঅ বলার সুযোগ না দেয়া, অসত্য বক্তব্য ও ভুল তথ্য প্রদান করা, শেখ হাসিনা ও তার দলীয় সংসদ সদস্যদের অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ এবং স্পীকার কর্মীসুলভ অআচরণ ও পক্ষপাতিত্ব বস্তুতপক্ষে জাতীয় সংসদকে আওয়ামী লীগের ইনজস্ব কার্যালয়ে পরিণত করেছিল।

৭। মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ:

যদিও মুষ্টিমেয় ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যতীত দল, মত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ নির্বিশেষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, আওয়ামী লীগ নিজ দল ছাড়া অন্য কাউকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছায় হানাদার বাহিনীর নিকট ধরা দিয়ে সমগ্র জাতিকে চমর বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের মুখে ফেল রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। অন্যদিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান দ্রুত স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়ে জীবন বাজি রেখে রণক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জিয়া এবং বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীসহ অএনক বীর মুক্তিযোদ্ধার ভুমিকাকে ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ।

৮। নির্বাচন কমিশন:

'জনতার মঞ্চের' নেতা আওয়ামী লীগের সেবাদাস সুবিধাবাদি আমলা শফিউর রহমানকে নির্বাচন কমিশন পদে নিয়োগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রতিষ্ঠনের নিরপেক্ষতা বিনষ্ট করেছে। আওয়ামী আমলের সকল উপনির্বাচনে সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ, আওয়ামী সন্ত্রাস ও ফলাফল নিয়ে কারচুপি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে বিতর্কিত করে তোলে।

৯। পাবলিক সার্ভিস কমিশন:

আওয়ামী লীগ নেতা ড. মোস্তফা চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও অন্যান্য দলীয় ব্যক্তিদের সদস্যসহ নানাপদে বসিয়ে কমিশনকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। বিগত ২০তম বি সি এস পরীক্ষার ফলাফল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১০। প্রতিরক্ষা:

প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে শেখ হাসিনা তার ফুপা মেজর জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানকে এলপিআর থেকে ফিরিয়ে এনে দীর্ঘ চার বছরের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান সিহেবে নিয়োগদান করেন। পরে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে চাকুরী শেষ হোয়ার আগেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন।

মিগ-২৯ ও ফ্রিগেট ক্রয়ে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, বড়াইবাড়ি ও পাদুয়ায় শেখ হাসিনার নতজানু বিদেশ নীতি, ভাওতাবাজির পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত তথাকথিত শান্তিচুক্তি ও গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি শেখ হাসিনা ও তার সরকারের দুর্নীতি ও দেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রমাণ বহন করে।

১১। কুক্ষিগত রেডিও টিভি:

আওয়ামী আমলে সরকারি রেডিও-টিভির স্বায়ত্বশাসনের নামে এয আইন পাশ করেছে তাকে রেডিও-টিভি শতকরা ১০০ ভাগ দলীয় প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়। বিটিভিতে শেখ হাসিনা, তার পিতা ও আওয়ামী নেতা-কর্মীদের প্রচার এত অধিক হারে ও নগ্নভাবে হয় যে জনগণ বিটিভির নামকরণ করে 'বাপ বেটির টিভি', আট্টার সংবাদের নাম দেয় 'ঠাট্টার সংবাদ'।

গদিচ্যুত হোয়ার পূর্ব মুহূর্তে আওয়ামী সরকার রেডিও-টিভির স্বায়ত্বশাসন না বলে বলা যায় 'আয়ত্বশ্বাসন'। অথচ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল রেডিও-টিভির পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান।

১২। অর্থনৈতিক দুরবস্থা:

আওয়ামী লীগ আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধসে পড়ার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ:

টাকার অবমূল্যায়ন:

টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় ১৮ বার যার ফলে টাকার মূল্য কমে যায ডলার প্রতি ১৭ টাকা।

শেয়ার মার্কেট:

শেয়ার মার্কেট ধ্বংস করা হয় অর্থমন্ত্রীর পুত্রবধূ, আওয়ামী ফায়দাভোগকারিগণ ও ভারতীয় মাড়োয়ারী বেনিয়াদোর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। পথের ফকির হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

বিদেশী পণ্যের অবাধ চোরাচালানের কারণে দেশীয় পন্য প্রচন্ডভাবে মার খেয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে শত শত শিল্প কারখানা। বৈধ-অবৈধ পথে আসা হাজার হাজার কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশকে পরিণত করেছে ভারতের একটি বৃহৎ একচেটিয়া বাজারে।

রাজস্ব আয়:

রাজস্ব আয় বাড়াতে চরমভাবে ব্যর্থ আওয়ামী সরকার শুধুমাত্র ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে দেশের ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেয় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। এ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের। চাটার্ড ব্যাংকের মতে, এ অংক ৯ হাজার কোটি টাকা। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে দফায় দফায়, নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের ওপর বসেছে উচ্চ হারের শুল্ক। বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায় অথচ উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় নি কৃষক।

চোরাচালান:

বিদেশী পণ্যের অবাধ চোরাচালানের কারণে দেশীয় পণ্য প্রচন্ডভাবে মার খেয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে শত শত শিল-প কারখানা। বৈধ-অবৈধ পথে আসা হাজার হাজার কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশকে পরিণত করেছে ভারতের একটি বৃহৎ একটি বাজারে।

প্রবৃদ্ধির হার:

জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় নি অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দফায় দফায় বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের দাম বাড়ানোতে ব্যায়ের বোঝা বেড়েছে অনেক। বেকার সমস্যা হয়েছে প্রকট। এতদসত্বেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা করেছে সরকার।

১৩। নামকরণ ও পারিবারিকরণ:

বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, বিমানবন্দর, রাস্তাঘাট, সেতু, ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, পদক ইত্যাদি সব কিছুর নামের সঙ্গে শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম যুক্ত করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি প্রদর্শণ বাধ্যতামূলককরণ ও তার কোন সমালোচনা করা চলবে না- এই মর্মে আইন, ‘‘জাতির পিতার পরিবারের নিরাপত্তা আইন ২০০১’’, শেখ হাসিনাকে গণভবন ও এসএসএফ দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান, শেখ রেহানাকে ধানমন্ডীতে বিশাল বাড়ি বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ঘটনা সারা দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে।

১৪। ধর্ষণ:

আওয়ামী শাসনামলে মহিলাদের মান-সম্ভ্রম নিরাপদ ছিল না। ০৮.১০.২০০০ তারিখের দৈনিক ইএত্তফাকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের জুলাই থেক ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষিতা হন ৮১৩৭ জন এবং নির্যাতনের শিকার হন ২৬০৭৯ জন নারী ও শিশু। এরূপ কয়েকটি লোমহর্ষক ঘটনার শিকার ছিল: টঙ্গীর পাগার মধ্যপাড়ার চার বছরের শিশু মিষ্টি, ঢাকার আদালত ভবনে ধর্ষিতা শিশু তানিয়া, নারায়নগঞ্জ আদালত এলাকায় গণধর্ষনের শিকার গৃহবধু শিল্পী আক্তার, পটুয়াখালীর অন্ত:স্বত্বা হনুফা বেগম, গুলশান থানার অভ্যন্তরে গণধর্ষিতা ব্রিটিশ মহিলা ও একজন মার্কিন কূটনীতিকের স্ত্রী, চাটমোহর থানার দিলালপুর গ্রামের রোমানা খাতুন, ডেমরা থানার নাজমা বেগম, ঝিনাইদহে ধর্ষনের ফলে নিহত অজিফা ও তার মা, রাউজানে ধর্ষিতা ও পরে পুড়িয়ে মারা গার্মেন্টস কর্মী সীমারানী প্রভৃতি।

১৫। শিক্ষাঙ্গন:

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই দেশের প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও রেজিষ্টারসহ শীর্ষ পদগুলোতে এবং সিণ্ডিকেটসহ নীতি নির্ধারনী সকল পরিষদে দলীয় লোকদের বসায়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সহস্রাধিক নেতাকর্মীকে যোগ্যতা বিচার না করেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো ছাত্রলীগ ক্যাডারদের খুন, ধর্ষণ, টেণ্ডারবাজি ও চাৎদাবাজির আখড়াতে পরিণত হয়। ছাত্রলীগ ব্যতীত অন্যান্য দলের প্রকৃত ছাত্রদের হল থেক বের করে দিয়ে ছাত্র নামধারী আওয়ামী পন্থী বহিরাগত গুণ্ডাদের আশ্রয় দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা সরকার পরীক্ষায় নকলবাজিতে এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করে। নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে লাঞ্চনা ও প্রহার করা হয়। এই সরকার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণের ক্ষেত্র নজিরবিহীন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা-জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। শেখ হাসিনা হয়তো জানেন না যে, এসব শিশু তার মত পাইকারি দরে ডক্টরেট ডিগ্রি ক্রয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করাকে ঘৃণা করে; তারা চায় লেখাপড়া করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে।

১৬। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ: কথা ও কাজের গরমিল

১৯৯৬ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আওয়ামী নেতারা প্রকাশ্যে বারবার অতীতের ভুলসমূহের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে সদাচারণের মুচলেকাসরূপ জাতিকে অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। ঐসব প্রতিশ্রুতি যে, ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা পরবর্তীতে তাদের শাসনামলে প্রমাণিত হয়। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক সরকার প্রতিষ্ঠা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের প্রসার, প্রচার মাধ্যমের স্বায়ত্বশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সম্পদের উন্নয়ন সাধন, শিক্ষক কর্মচারী, ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ, পাটের দাম মণপ্রতি ৫০০/-টাকা করা ইত্যাদি অসংখ্য অঙ্গীকারের কোনটিই পালন করেনি আওয়ামী সরকার। জনগণের কাছে এগুলো ইজ প্রহসনের মত মনে হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ কালো আইন, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন তো বাতিল করেইনি, বরং জননিরাপত্তা আইন নামে আরেকটি নতুন কালো আইন জারি করেছে।

আল্লাহর মেহেরবানীতে সরকার গঠনে সক্ষম হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রম নিশ্চত করা এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে আমরা যে কোন মূল্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনব ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব।

পরিচ্ছেদ-৩

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার: সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। বিএনপি মনে করে যে, বর্তমানে প্রতিযোগীতমূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাস্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সবোর্ত্তম ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের সামগ্রীক ও স্থায়ী কল্যাণসাধনো এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ এই দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং এক নতুন মাত্রা যোগ করার দাবি নিয়ে এসেছে। এই বহুমাত্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সময়ের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে মারাত্মক অবনতি হয়েছে, আত্মীয়করণ-দলীয়করণের সর্বগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে যেভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো, তাতে সন্ত্রাস দমন, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি দূরীকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, জলাবদ্ধতা ও যানজট সমস্যার সমাধান, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার সময়ের দাবি।

এই বিশ্বাস ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমরা ঘোষনা করছি যে-

৩.১ আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা:

আল্লাহর মেহেরবানীতে সরকার গঠনে সক্ষম হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রম নিশ্চত করা এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে আমরা যে কোন মূল্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনব ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ধর্ষনের মত অপরাধ দমন করে আমরা দেশকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ।

এই লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথার্থই প্রশিক্ষিত, যোগ্য, শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। এদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ন্যুনতম সময়ের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হবে এবং অস্ত্র সরবরাহের সকল উৎস বন্ধ করা হেব। অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে আইন চলবে নিজস্ব ও স্বাভাবিক গতিতে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী থানায় এজাহার নেয়া নিশ্চিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রভাব কিংবা সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সন্ত্রাসী বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক জেলায় বিশেষ আদালত স্থাপন করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

সমাজের সকল স্তরে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হবে এবং পুলিশ, বি ডি আর, আনছার ও গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনীকে সময়াপযোগী ও অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে জনগণকে শাসন করার জন্য নয়, সেবা করার জন্য কাজে লাগানো হবে।

দূনীতিদমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী্ও সমপর্যায়ের সকলের সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করা হবে।

৩.২ দুর্নীতি দমন:

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিদ্যমান সীমাহীন দুর্নীতির অবসান ঘটানো ছাড়া উন্নয়ন ও জনকল্যাণের কোন প্রয়াসই সফল হবে না। বিএনপি তাই দুর্নীতির মূলোৎপাটনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। এই লক্ষ্যে-

দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। এসব ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের সকল ব্যক্তির সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করা হবে।

৩.৩ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা:

বিদ্যুৎ সেক্টরের মারাত্মক অব্যবস্থা ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণে বিগত পাঁচ বছর জনগণ যে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছে এবং দেশের শিল্প-কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়ে জাতি যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তার দ্রুত অবসানের লক্ষ্যে বিএনপি নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে:

''সকলের জন্য বিদ্যুৎ' প্রাপ্তি ইনিশ্চত করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অআমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করা হবে। এই লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ

উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুক্তিসঙ্গত মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তাকে প্রতিযোগীতামূলক ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে।

'সিষ্টেম লস' কমিয়ে আনা হবে এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ভারসাম্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সেক্টরের সংস্কার (রিফর্ম) করা হবে। প্রতিটি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহেল কর্মীবাহিনীকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সর্ম্পক্ত করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে টার্গেটভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ত্বরান্বিত করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিশ্চিত করা হবে। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ বিল মওকুফের ব্যবস্থা অব্যহত থাকবে।

৩.৪ প্রশাসন ও ন্যায় বিচার:

দেশের প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে যথেচ্ছভাবে দলীয় এবং আত্মীয়করণ করার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা, মর্যাদা এবং সামর্থ্য ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এর বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে দেশ ও দেশের জনগণকে। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা পুন:প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএনপি ঘোষনা করছে যে-

দেশের সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার– সমুন্নত রাখা হবে এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করা হবে। ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।

প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি হবে মেধা, যোগ্যতা,দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

আইনের শাসন নিরুঙ্কুশ করার জন্য বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাপগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হবে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি রেডিও ও টেলিভিশনকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে যথার্থই স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। বেসরকারী উদ্যেগে দায়িত্বশীল রেডিও-টিভি প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহ দেয়া হবে।

প্রশাসনের সর্বস্তরে জনকল্যাণমূখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ড ও সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির সুসমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সেবার মূল্যায়ন ও যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বেতনভাতা নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে পে-কমিশন গঠন করা হবে।

আওয়ামী আমলে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে যেসব কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুৎ করা হয়েছে তাদের আপীল কেসগুলো বিবেচনা/পূন:বিবেচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে যেভাবে পদবি পরিবর্তন করে সচিবালয়ের কিছু কিছু পদের মর্যাদাশীল নামকরণ করা হয় একইভাবে সচিবালয়ের বাইরের সমপর্য়ায়ের পদসমূহেরও নামকরণ করা হবে।

সরকারি চাকুরীর বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতি তরান্বিত করা হবে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা রাজনৈতিক কারণে পদোন্নতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে বা হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের 'কেস' পুনর্বিবেচনা করা হবে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা, আর্থিক দৈন্যতা নিরসন এবং যুদ্ধাহত, দুঃস্থ ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কল্যান নিশ্চিত করার জন্য ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্যোগ মোকাবেলার মত জাতীয় তৎপরাতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা কবে।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, বিনিয়োগের সহজ ব্যবস্থা, তাদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যানের জন্য পৃথক বিভাগ/মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রশাসনকে গতিশীল করে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাওয়া এবং জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনী সমূহকে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে আরও দক্ষ ,আধুনিক, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আবদ্ধ মর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.৫ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি:

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা সর্বশক্তি দিয়ে লক্ষ করা হবে।

মাতৃভুমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত দেশপ্রমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে ভু-রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরীখে আরও দক্ষ, আধুনিক, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আরদ্ধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীকে আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ বাহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে শহীদ;রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরও অধিক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা সদস্য নিয়োগ ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা হবে। এই উভয় সংগঠনকে স্থানীয় ও জাতীয় নিরাপত্তা উন্নয়ন ও দেশগড়ার বিভিন্ন কর্মসূচীতে কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা হবে।

জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ এবং সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

বিএনপি এতদঞ্চলের সকল দেশ, বিশেষ করে নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে ফলপ্রসূ ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাবে এবং মৃসলিম দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবে।

সীমান্ত সমস্যা, আর্ন্তজাতিক নদীসমূহের পানির হিস্যা, সীমান্তপথে চোরাচালান, অপরাধ ও সন্ত্রাসসহ সকল বিতর্কিত বিষয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক ভিত্ততে সমাধানের উদ্যেগ নেয়া হবে। বিএনপি এতদ্বঞ্চলের শান্তি ও ঐক্য এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের স্বাধীনতা, ভৌগলিক

অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিসরূপ কার্যকলাপ সংগঠিত হতে দেবে না।

সার্ক, ওআইসি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার নীতি অনুসরণ করা হবে। দারিদ্র বিমোচন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। বিশ্বায়নের এই যুগে দেশের স্বার্থ সর্বত্রভাবে সংরক্ষিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তোলা বাংলাদেশর জন্য অপরিহার্য। এই লক্ষ্যেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি অর্থবহ ও বহুমাত্রিক ফোরাম হিসোবো সার্ক-এর পুনরুজ্জীবনের দরকার।

একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নই হবে বিএনপি অনুসৃত বাংলাদেশর বৈদেশিক নীতির আসল চালিকা শক্তি।

কোন রাষ্ট্রকে সামরিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের স্থল, জলপথ, সমুদ্রসীমাও আকাশ ব্যবহার করতে দেয়া হবে না।

গঙ্গা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি সমস্যার ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধানের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত এতদসংক্রান্ত চুক্তি পূনর্মূল্যায়ন করা হবে।

আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অনুসরণ করা হবে। বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান এবং জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। বর্ণবাদ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে প্রতিটি জাতিসত্ত্বার সতন্ত্র অস্তিত্ব ও সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা হবে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় অবিচলভাবে কাজ করা হবে।জাতিসংঘের আহ্বানে শান্তিরক্ষার কাজে বিশ্বের যেকোন স্থানে প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্ররণের নীতি অভ্যাহত থাকবে।

'আসিয়ান'সহ আমাদের নিকট ও নিকটবর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে।

গ্রাম সরকার ব্যবস্থা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি যুগান্তকারী অবদান। স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃইষ্টর লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং বেগবান করা হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ও পুঁজি বাজার নিশ্চিত করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুঁজি বাজার ধ্বংসের কারণ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ বিপর্যয় না ঘটে তার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:

বিএনপি প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসেনর সকল পর্যায় ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিত করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা ঘোষনা করছি যে-

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ গঠন এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলিকে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অধিকতর কর্মক্ষম, গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় সংস্থার পর্যায়ে উন্নীত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ্রাম সরকার ব্যবস্থা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি যুগান্তকারী অবদান। স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে

যোগ্য নেতৃত্ব সৃইষ্টর লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং বেগবান করা হবে।

৩.৭ অর্থনৈতিক কর্মসূচী:

দারিদ্র বিমোচন এবং জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখেই বিএনপি'র অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণীত হয়েছে। শ্রমঘন শিল্পবিকাশ, দ্রুততম সময়ে বর্ধিত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারনের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন এই কর্মসূচীতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা চাই পরিকল্পনা প্রণয়নে তৃণমূল পর্যায় থেকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, উন্নয়নের মূল ধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করতে, শিশু-কিশোরদের অধিকার সংরক্ষণ করতে, পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই উন্নয়ন উৎসাহিত করতে এবং বিজ্ঞান ও গবেষনা কর্মসূচীর উন্নয়ন সাধন করতে। উরুগুয়ে রাউন্ডর পর বিশ্বব্যাপী যে, অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হচ্ছে এবং তা থেকে পণ্যমান ও উৎপাদন ব্যয়ের যে তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়েছে, জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে সেই প্রতিযোগিতার সঙ্গে সফলভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে সাবধানতার সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কর কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হবে।

বিএনপি মনে করে যে, স্বনির্ভর অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের মত জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা দিতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি'র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

জনসংখ্যাঘন ও সম্পদবিরল বাংলাদেশের সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র। আর দারিদ্র নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান। তার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করা প্রয়োজন। সেই সেঙ্গ প্রয়োজন শ্রমঘন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে বিস্তৃতভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণদান ব্যবস্থা বিস্তৃত করে তাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করা।

এই লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার নিম্নরূপ:

নীতি ও সংস্কার:

জনগণের অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প তুণমূল পর্যায়ে গাম সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উর্দ্ধমূখী পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।

বিএনপি তার আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে আরো ব্যাপক ও গুণগতভাবে সম্প্রসারিত করবে।

বিএনপি উদার ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাস এবং তার সঙ্গে সংগতাপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিএনপি সংস্কার কর্মসূচীকে আরো ব্যাপক ও গভীর করবে। একই সাথে এই নীতির আনাড়ি ও যথাযথ বিচার-বিশ্লেষনহীন প্রয়োগের ফলে দেশী শিল্পের ভিত্তি ও বিকাশ যাতে বিঘ্নিত এবং কর্মসংস্থান সংকুচিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভজনক করার সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দেশী ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল উৎস। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার জন্য সময়োপযোগী নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হবে এবং সহায়ক অন্যান্য সার্ভিস নিশ্চত করা হবে। নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ যথাসম্ভব প্রত্যাহার করা হবে ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করা হবে। সকল অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ও পুঁজি বাজার নিশ্চিত করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের

আমলে পুঁজি বাজার ধ্বংসের কারণ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ বিপর্যয় না ঘটে তার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্তণে রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে জনগণের জন্য একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাধিক ও সবোর্ত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক দ্রুত সম্পন্ন করার উপযোগী প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্র দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, নারী সমাজের উন্নয়ন, কৃষি, যোগাযোগ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও গবেষণা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যহীন বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হবে না।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা হবে এবং জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে উ৭সাহিত করা হবে।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের অর্জনের লক্ষ্যে অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস এবং অপচয় রোধ করে আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি করা হবে। সকল ক্ষেত্রে সঞ্চয়কে উৎসাহ দান করা হবে।

বিনিয়োগ:

বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হেব। বিশেষ করে রেলপথ, সড়কপথ, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ও বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্র বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রাধান্য পাবে।

শিল্প ও বাণিজ্যে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অবকাঠামোতগত উন্নয়নসহ পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করে বিনিয়োগে হয়রানি বন্ধ করা হবে। দূর্নীতি ও চাঁদাবাজির হাত থেকে বিনিয়োগকারীদের মুক্ত রাখার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিনিয়োগ বোর্ডে "ওয়ান স্টপ সাভির্স" কে যথার্থই কার্যকর হবে যাতে শিল্পোদ্যেক্তাগণকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ভুমি সংগ্রহ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও টেলিফোন সংযোগ লাভ করতে কোন প্রকার জটালতার সম্মূখীন হতে না হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণ অবকাঠামো সুবিধাসমৃদ্ধ 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল' এবং 'ক্ষুদ্র শিল্প নগরী' গড়ে তোলা হবে। বিনিয়োগকারীদের মুনুফা নিশ্চত করার জন্য উৎপাদন শুরু হওয়ার পরবর্তী পাঁচ বছর আয়কর রেয়াত দেয়া হবে।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীগণকে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এবং অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহ দানের জন্য বিশেষ সুবিধা ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যেগী ব্যক্তি ও গ্রুপকে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও যন্ত্রাঙশ উৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রো শুল্ক রেয়াত দেয়া হবে।

সমবায়ীদের বিনিয়োগ প্রয়াসে সর্বাত্মক সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ছাড়াও শুল্ক ও কর রেয়াতের সুবিধা দেয়া হবে। একই ধরনের সহায়তা দেয়া হবে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কর্মসূচীর আওতায় কর্মহীন কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিক কিংবা বিনিয়োগের জন্য গঠিত তাদের গ্রুপকে।

যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ে রেল যোগাযোগ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। যমুনা সেতু ব্যবহারের চার্জ যুক্তিসংগত পর্যায়ে ধার্য করে

জনগণের যাতায়াত ও পণ্য চলাচলের জন্য তা সুগম করা হবে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও বিস্তৃত করার জন্য পদ্মা, ভৈরবের নিকট মেঘনা, রূপসা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে।

৩.৮ অবকাঠামো উন্নয়ন:

যোগাযোগ:

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভূ-অঞ্চল পরিবেষ্টিত নেপাল-ভুটান ও সমুদ্র উপকূলের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনকারী হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশের একটি অপূর্ব অবস্থানগত সুবিধা রয়েছে। এতদঞ্চলে পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সুবিধাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে।

সড়ক– রেল-নৌ ও বিমান যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ, বন্দর এবং সেতু নির্মাণের মত অবকাঠামোগত উন্নয়নে পর্যাপ্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হবে।

রাজধানীর সঙ্গে দেশের প্রতিটি থানার এবং প্রতিটি থানার সঙ্গে প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

দেশের নদ-নদী সমূহ ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিঙমিত ড্রেজিংসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

উপকূলবর্তী ও দীপাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানা খাতে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা হবে।

যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ে রেল যোগাযোগ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

যমুনা সেতু ব্যবহারের চার্জ যুক্তিসংগত পর্যায়ে ধার্য করে জনগণের যাতায়াত ও পণ্য চলাচলের জন্য তা সুগম করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও বিস্তৃত করার জন্য পদ্মা, ভৈরবের নিকট মেঘনা, রূপসা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে।

রাজধানী ঢাকার জানজট নিরসনে গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটি প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বিত ও পরিবেশ সহায়ক পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধন করা হবে।

রাজধানী ঢাকায় প্লাইওভার নির্মাণ, মনোরেল চালু, বাইপাস রোড এবং সার্কুলার রেল ও সড়ক নির্মাণ করে যানজট সমস্যার সমাধান করা হবে।

পুরাতন রেল স্টেশন, রেল লাইন, ইঞ্জিন ও বগি সংস্কার ও ব্রডগেজ লাইন বিস্তৃত করে রেল ব্যবস্থাকে একটি যথার্থই সেবাধর্মী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

নদী ও সমুদ্র বন্দরসমূহকে উন্নত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের অবকাঠামোর উন্নতি সাধন করে বন্দরের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে উভয় বন্দর যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি করা কবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিমানবন্দর স্থাপন ও বিমান চলাচলের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস:

সারা দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অবিলম্বে দেশের উত্তরাঞ্চলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

অনুন্নত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির ত্বরিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহসহ অবকাঠামো নির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনে উৎসাহদান এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সকল নাগরিকের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং সারা দেশে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

গৃহায়ন:

শহর ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি কর্মচারি ও শহরের মধ্যবিত্তদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।

রাজধানীর ওপর জনসংখ্যার চাপ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে দেশের ছোট ও মাঝারি শহর উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রাজধানীর আশেপাশের শহর উন্নয়ন ও যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ, সুলভ, নিয়মিত ও দ্রুত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভুমিহীন ও গৃহহীন দুঃস্থ মানুষদের জন্য সরকারি উদ্যেগে স্বাস্থ্যসম্মত আবাস,শিক্ষা চিকিৎসা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্বলিত ‘অধিকার’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

রাজধানীসহ বড় বড় শহরের বস্তিবাসীদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বিত গ্রহায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রকল্প “পরিবেশ বাংলা” বাস্তবায়ন করা হবে।

বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সার্বিক সহায়তা দান এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। পাশাপাশি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

টেলিযোগাযোগ:

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক, বহুমূখী, সহজলভ্য ও ব্যাপকভিত্তিক করে অধিকসংখ্যক জনগণকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের আওতায় আনা হবে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সুলভ ও সম্প্রসারিত করা হবে।

মেবাইল ফোন চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সড়ক পরিবহন:

“জনগণের জন্য সড়ক পরিবহন” এই নীতিমালার ভিত্তিতে সড়ক পরিবহন নীতি প্রণয়ন করা হবে।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে বিরাজমান সকল ধরনের হয়রানি বন্ধ করে সেবার মান উন্নয়নের জন্য বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে গণমূখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে

গড়ে তোলা হবে। সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে ড্রাইভারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হবে।

সড়ক দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের বীমার ক্ষতিপূরণ স্বল্পসময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পর্যটন:

অবসর বিনোদন এবং বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে। সুন্দরবন, সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে।

৩.৯ কর্মসংস্থান ও বেকার সমস্যা নিরসন:

সাধারণ বিবেচনায় বিপুল জনসংখ্যা দেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। অথচ এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে তা সম্পদ হিসেবে পরিণত হবে। এই জনসম্পদ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। বিএনপি মনে করে যে, দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রর দায়িত্ব। একই সাথে দেশের ভূমিহীন, বিত্তহীন দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিরাজমান দারিদ্র ও হতাশা দূর করার জন্যও কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করার কোন বিকল্প নেই। বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সার্বিক সহায়তা দান এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। পাশাপাশি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং বিদেশে কাজ করতে আগ্রহীদের পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাস ও মিশনকে কাজে লাগানো হবে।

বন্ধ শিল্পসমূহ যথাসম্ভব সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে পুনরায় চালু করা, দেশের তাঁত শিল্পকে সহায়তা দিয়ে লাভজনক করা, অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহ দান এবং সীমান্তে অবাধ চোরাচালান কঠোরভাবে বন্ধ করে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যকে অসম-প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে কর্মরক্ষা ও নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এসব বিবেচনাকে সামনে রেখে বিএনপি সুনির্দিস্ট কর্মসূচী হিসেবে যা গ্রহণ করবে তার মধ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সেবা ও নির্মাণ খাতকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যেক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রাথমিকভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়ে এমন শ্রমঘন প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

শিক্ষিত ও বেকারদের কর্মসংস্থান হতে পারে এমন সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। যুবসমাজকে স্বল্প ব্যয়ে/ বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহজ শর্তে ঋণদানের মাধ্যমে পুঁজি যোগান কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হবে।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে যুবসমাজকে উৎসাহিত করার জন্য বিনা জামানতে ঋণদান কর্মসূচী জোরদার করা হবে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসা বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও যোগাযোগে উন্নতি সাধনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি (ইনফরমেশন টেকনোলজী) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বিদেশে দক্ষ, অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জনশক্তি রপ্তানীর ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিদেশে শ্রম চাহিদার তথ্যের ভিত্তিতে এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুসারে দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা হবে।

বিভিন্ন পেশায় শিক্ষিত ও দক্ষ ব্যক্তি যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবি, বিজ্ঞানীদের স্বকর্ম সংস্থানের জন্য তফসীলি ব্যাংকসমূহে পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন এবং পেশাজীবিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা হবে।

বিদেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীকে অধিকতর অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে আরো সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে আরো শক্তিশালী করা হবে। সকল বেসরকারি প্রাইমারী স্কুল সরকারি করা হবে। প্রাইমারী বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য (সরকারি-বেসরকারি) দূর করা হবে।

৩.১০ শিক্ষা:

বিএনপি অতীতের মতো আগামীতেও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে। ভবিষ্যতে জাতীয় বাজেটসমূহে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানচর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও অনাচারমুক্ত করা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা আরো অআধুনিকীকরণ করা হবে। স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ ও শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার কর্মসূচী আরো জোরদার করা হবে।

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেশন-জট রোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ এবং বেসরকারি উদ্যোগকে অগ্রাধিকার ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকমন্ডলীর জ্ঞানচর্চা ও গেবষনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টার অফ এক্সেলেন্স গড়ে তোলা হবে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীকে অধিকতর অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে আরো সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে আরো শক্তিশালী করা হবে। সকল বেসরকারি প্রাইমারী স্কুল সরকারি করা হবে। প্রাইমারী বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য (সরকারি-বেসরকারি) দূর করা হবে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং কলেজ শিক্ষক/কর্মচারীদের সরকারি অনুদানের পরিমাণ ১০০% করা হবে। বেসরকারি শিক্ষকদের অবসরগ্রহণকালে গ্র্যাটুইটি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মসজিদভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা উৎসাহিত করা হবে। বয়স্ক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচী জোরদার করা হবে। সর্বস্তরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরী ও বুত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রি করা হবে। বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হবে।

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী করা হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে ধর্মশিক্ষার ওপর যথাযথ

গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যাদির যুক্তিসঙ্গত সমাধান করা হবে।

৩.১১ খেলাধূলার উন্নয়ন:

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের যুব ও কিশোর সমাজের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো দেশের খেলাধূলার মানোন্নয়নের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজধানী ছাড়াও বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে তরুণদেরকে খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশে স্টেডিয়াম নির্মাণ, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় খেলাধূলপার জগতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করতে বিএনপি অঙ্গিকারবদ্ধ। বিগত পাঁচ বছরে অর্থের অপচয়, বিদেশ ভ্রমণ ও ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে যতখানি, খেলাধূলার সত্যিকারের মানোন্নয়ন সে তুলনায় হয়েছে অতি সামান্য। বরং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় লজ্জাজনক ব্যর্থতা জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে।

বিএনপি অঙ্গিকার করছে যে:

প্রত্যেকটি প্রধান ও সম্ভাবনাময় খেলায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কোচিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিদেশে কোচিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিভিন্ন খেলায় সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

‘সুস্থ দেহে সুন্দর মন’ – এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জীবন গড়ার উদ্দেশে প্রাইমারী পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাদূলাকে পাঠ্য তালিকায় যথাযথ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রচুর সংখ্যক আই.টি ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলে দেশকে আই.টি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

আই.টি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যথাযথ গুরুত্ব ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি পৃথক তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেলি যোগাযোগকে সহজলোভ্য ও সুলভ করে তথ্য প্রযুক্তিকে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

আই.টি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য প্রযুক্তি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১২ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির অধিকার:

বিজ্ঞান:

বিজ্ঞান ও কারিগরী উৎকর্ষের এই যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিএনপি সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে সক্ষম ও আগ্রহীগণ যাতে দেশেই তাদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পান সেজন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রাধিকার:

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিবেচনায় তথ্য প্রযুক্তিকে সকল উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে এর যথাযথ উন্নয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতি উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উন্নতমানের তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতদ্ব্যতীত এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলোও গ্রহণ করা হবে:

ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইনফরমেশন হাইওয়েতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাংলাদেশের জন্য একটি ডোমেইন নাম প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ আইটি কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি ইন্টারনেট পল্লী গড়ে তোলা হবে।

বেসরকারি উদ্যেক্তাগণ যাতে আই.টি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে উৎসাহী বোধ করেন সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। সেই সঙ্গে এই খাতের বিনিয়োগে প্রবাশী বাংলাদেশীগণকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রচুর সংখ্যক আই.টি ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলে দেশকে আই.টি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

আই.টি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যথাযথ গুরুত্ব ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি পৃথক তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেলি যোগাযোগকে সহজলোভ্য ও সুলভ করে তথ্য প্রযুক্তিকে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

আই.টি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য প্রযুক্তি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই সঙ্গে দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় আই.টি বিষয়ে সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে।

মহিলাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। নির্যাতিত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যৌতুকবিরোধী আইন আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.১৩ নারী সমাজ:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তারা তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ রয়ে গেছেন। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে শিক্ষাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন ও পরনির্ভরশীল রেখে কোন জাতি সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। নারী সমাজকে তাদের যথার্থ সামাজিক অবস্থান ও মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এ অবস্থা চলতে দেয়া উচিত নয়। নারীসমাজের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতীতে সরকার পরিচালনাকালে বিএনপি অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা গোষনা করছি যে,

সংসদে নারীদের আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন্য তাদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকটি কন্যা সন্তানের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি পৌর এলঅকাসহ সারাদেশে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে আরো অধিকভাবে সম্পৃরক্ত করার এবং নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য সহজ শর্তে ব্যাপক ঋণদান ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

সরকারি চাকুরীতে মহিলাদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। সক্ষম বিধবা ও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তাহীন মহিলাদের শিক্ষা, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করার হবে। বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হবে।

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং সমাজকল্যান বিভাগসহ গ্রাম এলাকায় লভ্য বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কর্মজীবি মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সরকারি তদারকি ব্যবস্থা নেয়া হবে। কর্মজীবি মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন শহরে হোষ্টেলের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

মহিলাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। নির্যাতিত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যৌতুকবিরোধী আইন আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী আইনগুলি সমন্বিত করে আরো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

এখনো দেশে মেয়েরা এসিড নিক্ষেপের মতো বর্বরতার শিকার হচ্ছে। এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী কোন অপরাধী যেন আইনের হাত থেক রক্ষা না পায় তা নিশ্চিত করা হবে এবং বাজারে এসিড বিক্রির উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে।

নারী ও শিশু পাচার রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণসহ কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসূতি মৃত্যুর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য সকল উদ্যোগ ও ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণদান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

৩.১৪ শিশু অধিকার:

দেশের ভবিষ্যৎ আমাদের সন্তানেরা। শিশুরা আমাদের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। তাদেরকে সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ তাদের হাতেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বিএনপি 'সবার আগে শিশু' ও 'শিশুদের জন্য হা বলুন' – বিশ্বব্যাপি এই অঙ্গিকারকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। বিএনপি ঘোষনা করছে যে,

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী আরো জোরদার করা হবে।

শিশু মৃত্যুর হার কমিএয় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সকল শিশুর জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

যথা শীঘ্র সম্ভব শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো হবো। সেই লক্ষ্যে কর্মজীবি শিশু, পথশিশু, দুঃস্থ ও ভাগ্যহত শিশু প্রতিবন্ধী শিশুদোর কল্যাণের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিশু নির্যাতন বিরোধী ্ইনসমূহ সমন্বিত করে আরও দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

কৃষি উপকরণসমূহ যথা সার, উন্নত বীজ, সেচ যন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয়ভাবে কৃষি উপকরণ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সোচ ব্যবস্থা উন্নত ও সহজলভ্য করা হবে।

কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে।

৩.১৫ স্বাস্থ্য:

সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই খাতে পর্যাপ্ত এবং ক্রমবর্ধমান হারে বাজেট বরাদ্দ করা হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও স্বল্প বিত্তের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা আরও উন্নত করা হবে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে আধুনিক যুগোপযোগী ও অধিকতর জনকল্যাণমূখী করা হবে। এই লক্ষ্যে স্বাসবথ্যসেবাকে পণ্য করার বর্তমান নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

অতীতে বিএনপি সরকার দেশের হাসপাতালগুলিকে থানা পর্যায়ে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যা, জেলা পর্যায়ে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যা ১০০ শয্যা থেকে ২০০ শয্যায় উন্নীত করণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় জেলা সদর হাসপাতালসমূহকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে এবং সকল হাসপাতাল আধুনিকায়নসহ ঔষধপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিএনপি সরকারের আমলে চালুকৃত সকল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রে ২ জন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা হবে।

জনগণের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল শাখায় দক্ষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পদ সৃষ্টি ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

দেশের সকল সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নিবন্ধন, সমন্বিত কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবার মান নিশ্চিতকরণ, যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ, কলেজসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পৃথক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

স্বাস্থ্য প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

৩.১৬ কৃষি ও কৃষক:

বিএনপি কৃষিখাতে এবং কৃষকের অবস্থা উন্নয়নের জন্য অতীতে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা ভর্তূকি দিয়ে সুদসহ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হয়েছে। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়েছে। জাতীয় জিডিপি'তে কৃষিখাতের অবদান এখনও শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল ও দরিদ্র অংশ এখনও কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। এই খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিএনপি নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

কৃষি উপকরণসমূহ যথা সার, উন্নত বীজ, সেচ যন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয়ভাবে কৃষি উপকরণ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সোচ ব্যবস্থা উন্নত ও সহজলভ্য করা হবে।

কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে।

কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য কৃষকদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যবস্থায় ব্যাপক কৃষি শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কৃষিখাতে অধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে। গ্রামীণ জনসাধারণের ও উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ও অধিক হারে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

একটি জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম গড়ে তুলে নৌ-পরিবহন ও সম্পদের প্রবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নত ব্যবস্থা চালু করা হবে।

হাঁস-মুরগী, পশুপালন এবং মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও বেগবান ও মজবুত করার লক্ষ্যে কুষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য সকল সাহায্য (ঋণ, কারিগরি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

ভূমির গুণগত মান এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ও কৃষকের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে রপ্তানীমূখী চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা দূর করার জন্য বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ধান-চাউল-গম উৎপাদনের পাশাপাশি শস্য বৈচিত্রিকরণের কর্মসূচীকে জোরদার করা হবে। শাক-সব্জী, আলু, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন ও রবিশস্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য এবং মৌসুমী ফলমূলে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এসব পণ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও দেশে বিদেশে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কৃষক ও কৃষির সামগ্রীক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সুবিন্যস্ত করে যুগোপযোগী, দক্ষ ও গতিশীল করা হবে।

কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণের জন্য কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় ভর্তূকি প্রদান আবশ্যক। তাই সার, বীজ, সেচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃষককে ভর্তূকি দেয়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে। ভর্তূকির সুফল যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক অধিকহারে পায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হবে।

বিগত বিএনপি সরকার খোলা জলমহলের ইজারা প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে মৎসজীবি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ

করে। সেই সঙ্গে মৎস সম্পদ উন্নয়নে অন্যান্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বিএনপি অঙ্গীকার করছে যে-

দেশের সমস্ত জলমহাল, খালবিল, নদীনালা, হাওর-বাওর সংস্কার করে প্রকৃত মৎসজীবিদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

৩.১৭ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন:

বিগত বিএনপি সরকার খোলা জলমহলের ইজারা প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে মৎসজীবি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে মৎস সম্পদ উন্নয়নে অন্যান্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বিএনপি অঙ্গীকার করছে যে-

দেশের সমস্ত জলমহাল, খালবিল, নদীনালা, হাওর-বাওর সংস্কার করে প্রকৃত মৎসজীবিদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

মৎসজীবিরা যাতে সহজে ব্যাংক ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

মৎসজীবিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বাস্তবমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৩.১৮ সমবায়:

স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়কে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

অনগ্রসর পেশাজীবিগণের কর্মসংস্থান এবং কল্যাণে সমবায় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সমবায় আন্দোলনকে দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হবে।

সমবায়ী কৃষকদের ৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত সমবায় কৃষিঋণের আসলসহ সুদ ও দণ্ডসুদ মওকুফ করা হবে।

৩.১৯ ভূমি ও বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা:

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে মন্ত্রী, এমপি ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন সমূহের নেতাকর্মীরা সারা দেশে সরকারি জমি, জলমহাল, বনজ সম্পদ ও নিরীহ জনগণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ নির্বিবাদে দখল ও লুট করেছে। তাদের হাত থেকে ঈদগাঁ, মসজিদ, মন্দির, গোরস্তান এবং শ্মশানঘাটও রক্ষা পায়নি। এসব অনাচার ও লুণ্ঠনের বিচার আজ গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে:

বিগত সরকারের আমলে অবৈধভাবে বরাদ্দকৃত/ দখলকৃত ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ উদ্ধার করা হবে এবং লুণ্ঠনকৃত বনজ সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। এসব অপরাধের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভূমির সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি নীতি যুগোপযোগী করা হবে।

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রভাবমুক্ত করে খাসজমি বিতরণে ভূমিহীন, বিত্তহীন, বস্তিবাসী ও আশ্রয়হীনদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

জলমহল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলমহলের প্রকৃতি ও আঞ্চলিক বাস্তবতার নিরিখে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

দেশে সুষ্ঠু প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বনভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে। বন সম্পদ রক্ষা এবং সামাজিক ও উপকূলীয় বনায়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করা হবে।

৩.২০ শিল্পোন্নয়ন:

যথাশীঘ্র সম্ভব শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো হবে। সেই লক্ষ্যে কর্মজীবি শিশু, পথশিশু, দুঃস্থ ও ভাগ্যহত প্রতিবন্ধি শিশুদের কল্যাণের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিশু নির্যাতন বিরোধী আইনসমূহ সমন্বিত করে আরও দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

দেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবসাথা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এসব ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকা গড়ে তোলা হবে।

তৈরী পোশাক শিল্পের আরও বিকাশ, উৎকর্ষসাধন, পৃষ্ঠপোষকতা, বিশেষ করে উরুগুয়ে রাউণ্ড পরবর্তী চাহিদা সমূহ (যথাঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পশ্চাদসংযোগ স্থাপন করে এই শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা) পূরনের লক্ষ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে পূণর্গঠিত করে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্প মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে।

রুগ্ন শিল্প পুণর্বাসনের বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট মজুদ রেয়েছ বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যতের দিনগুলিতে সারা দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানোর বিষয়টিতে বিএনপি সর্বেচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

৩.২১ বাণিজ্য:

দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করার হবে। তবে কোন অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ সরকার অনুসৃত উন্মুক্ত সীমান্ত অর্থনীতির প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বৈদেশিক আঞ্চলিক বাজারে পন্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা লাভের চেষ্টা করা হবে এবং এভাবে বাণিজ্য ঘাটতির প্রতিকূলতা দূর করার প্রয়াস নেয়া হবে।

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা করার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে চোরাচালান কঠোর হস্তে দমন করা হবে। চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী

হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৩.২২ খনিজ সম্পদ:

দেশের তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন কর্মসূচী জোরদার করা হবে। সেই সঙ্গে বড়পুকুরিয়ায় কয়লা ও মধ্য পাড়ার কঠিন শিলা উত্তেলনের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে।

খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যতের দিনগুলিতে সারা দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানোর বিষয়টিতে বিএনপি সর্বেচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য সকল খনিজ পদার্থ থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.২৩ পানি নীতি:

ভারতের মধ্য দিয়ে আসা বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক নদীগুলোর উজানে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে বাংলাদেশ বহুবিধ সমস্যা ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবনাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। নাব্যতা ও মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক স্রোতধারা বিনষ্ট হবার ফলে পলি জমে বাংলাদেশের নদীগুলোর পানিধারণ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। শুস্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ, নদীগুলোর নাব্যতা ও সামগ্রীক সেচ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য বাংলাদেশে এখন পানি ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সকল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধন করে তাকে সময়োপযোগী করা হবে। খাল-বিল-নদী খনন ও পুনর্খনন করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পানি সংরক্ষণ ও সেচ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে।

ভারতের সঙ্গে ত্রিশ বছর মেয়াদি চুক্তি করে আওয়ামী সরকার বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার পথ করে দিয়েছে। এই চুক্তিতে ‘গ্যারান্টি ক্লোজ’ না থাকায় বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা অবশ্যই চুক্তিটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করব, যাতে করে বাংলাদেশ গঙ্গাসহ সকল নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতভাবে পেতে পারে।

৩.২৪ যুবসমাজ:

দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বয়স ৩০ বছরের নিচে এবং তার একস বিরাট অংশই যুববয়সী। এদের অনেকেই এখন শিক্ষিত অথচ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। অবশিষ্টদের বেশীর ভাগই মূলত দরিদ্রতার কারণে সাধারণ কিংবা কারিগরী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং কর্মহীন। এই বিরাট সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পায় না। বেকারত্ব ও মানসিক পীড়নে ক্রমাগত দগ্ধ এই সম্ভাবনাময় তরুণরা ক্রমবর্ধমানহারে সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড ও মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

এদের জন্য কর্মসংস্থান অথবা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মুলত রাষ্ট্রের। বিএনপি অবহেলিত ও ধ্বংসপ্রায় যুবসমাজকে উৎপাদনশীল নিযুক্ত করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এব্যাপারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত নীতি ও কর্মসূচী অনুসরণ করা হবে।

শহীদ রাস্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত কমসূচীর ধারাবাহিকতায় সকল শিল্পাঞ্চলে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.২৫ শ্রমিক সমাজ:

যো কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমজীবি মানুষের ভুমিকা ও অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিএনপি দেশের শ্রমজীবি জনগণের প্রকৃত কল্যাণসাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে-

সুস্থ ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আই.এল.ও কনভেনশনসমূহ এবং অথর্থনৈতিক বিকাশের ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রম আইন সংস্কার ও যুগোপযোগী করা হবে।

শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা নির্ধারণের জন্যে মজুরি কমিশন গঠন করা হবে এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় ন্যুনতম মজুরি ঘোষনা করা হবে।

শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য সকল শিল্পাঞ্চলে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন/ সম্প্রসারণ করা হবে।

শহীদ রাস্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত কমসূচীর ধারাবাহিকতায় সকল শিল্পাঞ্চলে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

রিক্সা, অটোরিক্সা, হকার্স, ঘাট ও নির্মাণ শ্রমিকসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর চাঁদাবাজ-মাস্তানদের অত্যাচার বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.২৬ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উপজাতীয় জনগণ:
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আদর্শ দেশ বাংলাদেশ। বিএনপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গভীরতর করা ও সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস থেকেই বিএনপি ঘোষনা করেছ যে:

সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং সকল ভয়-ভীতির উর্দ্ধে থেকে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করবে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারসহ সকল অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করা হবে। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

সংবিধানে সংরক্ষিত সংখ্যালঘুদের অধিকারসমূহ বিএনপি সুরক্ষিত করবে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি,সৌহার্দ ও সৌভ্রাতৃত্ব গভীরতর করার অব্যাহত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনগ্রসর পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং তাদের জন্য চাকুরী ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা হবে। তাদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনগ্রসর তফসীলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক অতীতে প্রদত্ত উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে।

হিন্দু কল্যান ট্রাষ্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্ট ও খৃষ্টান কল্যাণ ট্রাষ্টের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে ও সেই লক্ষ্যে এই সব ট্রাষ্টের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

এডভোকেট কালিদাস বড়াল, সমাজকর্মী আলফ্রেড সরেনসহ আওয়ামী আমলে নিহত সকল সংখ্যালঘু নেতা হত্যা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নারী নির্যাতন, জমিদখল, মন্দির দখল, প্রতিমা ভাঙ্গা ইত্যাদি অপরাধের বিচার করা হবে।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্র ধর্মীয় অথবা উপজাতীয় সঙখ্যালঘুদের প্রতি কোনরুপ বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

৩.২৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা:

স্বাধীনতার পর উপজাতি সমূহের জাতিসত্তা সম্বন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভ্রান্ত নীতি জন্ম দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার, যার কারণে দীর্ঘ তিন যুগ ধরে বাংলাদেশে এক দশমাংশ অঞ্চলে অশান্তি ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই অপার সম্ভাবনাময় বিশাল এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আওয়ামী লীগ সরকার গোপনে ও জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে সংবিধানের সাহায্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে চুক্তি করেছে তা এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে সমস্যাটির সংবিধানসম্মত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

৩.২৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা, ঘুর্নিঝড়, খরা, ভুমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা এবং মানুষের জানমাল রক্ষার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বৃক্ষনিধন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বৃক্ষনিধনকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আইন ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করা হবে।

নির্বিচারে পাহাড় কাটা ও ইটের ভাটায় জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

৩.২৯ পরিবেশ:

যে জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিবেদিত সেই জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও জীবন আজ পরিবেশ দূষনের কারণে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। ঢাকা মহানগরীর বায়ু ও শব্দ দূষনের পরিমান এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, নারায়নগঞ্চসহ দেশের প্রায় সব শহরের বায়ু এবং দেশের প্রায় সবগুলো নদী, নালা, খাল, বিলের পানি মারাত্মক দূষনের শিকার। পানিতে অতিরিক্ত আর্সেনিকের ফলে দেশের বরাট জনগোষ্ঠী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। নগর-বন্দরের জনসমাজ শব্দ দূষনের ফলে অকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এর সাথে বৃক্ষনিধন, রাসায়নিক সার, কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া গোটা দেশের পরিবেশকে বিষময় করে তুলেছ। এই অবস্থা থেকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জনগণকে পরিত্রাণ দেয়া না হলে অর্জিত কোন উন্নয়নই তাদের কাজে আসবে না। এই প্রেক্ষিতে বিএনপি দেশের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা নেবে তার মধ্যে:

দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

বৃক্ষনিধন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বৃক্ষনিধনকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আইন ফলপ্রসূভাবে

কার্যকর করা হবে।

নির্বিচারে পাহাড় কাটা ও ইটের ভাটায় জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

সকল সড়ক, জনপথ ও রেলপথের পাশে বৃক্ষরোপন করা হবে। সরকারি সকল অফিস প্রাঙ্গন ও সম্পত্তিতে যত বেশী সম্ভব গাছ লাগানো হবে। সমগ্র উপকূল জুড়ে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।

যানবাহনে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত ও সহজলোভ্য করা হবে।

যানবাহন থেকে বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার নির্গমন ও হাইড্রোলিক হর্ণের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহৃত হয় এমন সব শিল্প জনবসতি থেকে দূরে স্থানান্তর করা হবে এবং শিল্প বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিস্কাশন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

শহরে যানবাহন ও জনবসতি হ্রাসের লক্ষ্যে শহরের বাইরে গার্মেন্টস পল্লী ও শিল্প পল্লী নির্মাণ করা হবে।

বাস-ট্রাকের টার্মিনাল যথাসম্ভব শহরের বাইরে রাখা হবে।

শহরের জানজট নিরসনের জন্য দ্রুত ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেয়া হবে। শব্দ দূষন, বায়ু দূষন ও পানি দূষনের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হবে এবং প্রয়োজনে কঠোরতর নতুন আইন করা হবে।

কৃষিকাজে জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

জাতীয় স্বার্থে পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, গণপরিবহন ও বিপনীকেন্দ্রসমূহকে ধুমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষনা করা হবে।

পানিতে আর্সেনিক সমস্যা দূর করার জন্য অতীব জরুরী ভিত্তিতে সকল প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং অচিরেই বাংলাদেশকে আর্সেনিকের অভিশাপমুক্ত করা হবে।

৩.৩০ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক:

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে ঘিরে যে সংস্কৃতি তার লালন ও বিকাশকে অবরুদ্ধ করে বিগত পাঁচ বছর বিদেশী অপসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিএনপি'র লক্ষ্য থাকবে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক শিল্প-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন ও উৎসাহ প্রদান। সেই উদ্দেশ্যে:

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে আমাদের সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো হবে। দেশীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রকার অপসংস্কৃতি রোধ করা হবে।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামী মূল্যবোধ, ঈমান ও আকিদা রক্ষা ও উজ্জীবিত করা হবে। একই সেঙ্গ অন্যান্য সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও পরিচয় সুরক্ষা ও বিকশিত করার অবাধ সুযোগ নিশ্চত করা হবে।

শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং তাদেরকে বিশেষ স্বীকৃতি এ আনুকূল্য প্রদান

করা হবে।

৩.৩১ মানবাধিকার:

বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষনার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে এবং এই লক্ষ্যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদনের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আওয়ামী সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এবং জননিরাপত্তা (বিশেষ আইন) আইন ২০০০ বাতিল করা হবে।

বিএনপি বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে।

গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভিজিডি প্রকল্প ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ কর্মসূচী জোরদার করা হবে। গ্রামাঞ্চলে যখন কর্মসংস্থান হ্রাস পায় তখন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব কর্মসূচী ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা হবে।

৩.৩২ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:

বিগত পাঁচ বছর ধরে আওয়ামী সরকার অনুসৃত ভ্রান্ত সংস্কারনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সার্বিক অর্থনীতি অচল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আগামী দিনে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং তার সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্য নিম্নোক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে:

স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ স্কীমের আওতায় অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের যথাযথ আনুতোষিক দেয়া হবে। তবে দক্ষ ব্যক্তিদের অবসর গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।

প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্যত্র কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক নিয়োগ উৎসাহিত করা হবে ও সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।

গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভি জি ডি প্রকল্প ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ কর্মসূচী জোরদার করা হবে। গ্রামাঞ্চলে যখন কর্মসংস্থান হ্রাস পায় তখন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব কর্মসূচী ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা হবে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য-বীমা ব্যবস্থা চালু করা হবে।

বাংলাদেশের কর্মজীবি মানুষের একাংশ পেনশনের সুবিধা পান। কিন্তু কর্মজীবি শ্রমজীবি মানুষের বিপুল অংশ তাদের কর্মজীবন শেষে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বয়স্ক গরীব ও প্রান্তিক কৃষক এবং গ্রাম ও শহরের দিনমজুরদের অবস্থা আরও করুণ। বয়সের ভারে ন্যুজ এবং কর্মশক্তি নিঃশেষিত এই মানুষগুলির জীবনের শেষ প্রান্তের বছর ক’টি বিড়ম্বনা, হতাশা এবং ক্ষুধায় ভরা। এইসব প্রবীণ নাগরিকদের জীবনের আশু প্রয়োজনগুলি আংশিকভাবে হলেও মেটাবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

বিধবা ও বয়স্কভাতা ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা হবে ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

বেকারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের কার্যকর ব্যস্থা নেয়া হবে। যাদের জন্য কোনরূপ কর্মসংস্থানেরই ব্যবস্থা নেয়া যাবে না তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে বেকার ভাতা প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সন্ত্রাসমুক্ত জীবন যাপন করতে, দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতিহীন, সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে , নিজ নিজ ধর্মকর্ম নির্ভয়ে পালন করতে, এক কথায় পচনশীল সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে, আমরা বিশ্বাস করা, আগামী নির্বাচনে আমরা দেশবাসীকে আমাদের সাথী হিসেবে পাব। বিগত পাঁচ বছরে জাতিকে যে অন্ধকারে নিপতিত করা হয়েছে তা থেকে উত্তোরণের পথ আমাদের অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে।

পরিচ্ছেদ-৪

উপসংহার

পরিচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ বিএনপি'কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত করলে ইনশাআল্লাহ্ বাংলাদেশ একটি শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ জনসমাজে পরিণত হবে। সমগ্র পল্লী অঞ্চল রূপান্তরিত হবে সমৃদ্ধ জনপদে। দেশে একটি সক্ষম ও কর্মোদ্যোগী বেসরকারি খাত সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি উদ্যোগ ও সমবায় রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মেধা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সততা পাবে যথাযথ মূল্যায়ন।

দেশবাসী সন্ত্রাস ও দারিদ্রের করাল ছায়া থেকে মুক্ত হয়ে জীবনযাত্রার একটি উন্নত মানে পৌঁছবে। বেকারত্বের হার বিশেষভাবে হ্রাস পাবে এবং দেশের শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে কর্মে নিয়োজিত থাকবে। সর্বোপরি এদেশের শ্বাশ্বত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের মধ্যেই একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। সকলের জন্য, বিশেষত মহিলা ও দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য , সুযোগ-সুবিধার দ্বার অবারিত হয়ে একটি স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক ও অগ্রসরমান সমাজ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে। আমাদের সন্তানেরা পাবে নিশ্চিন্তে বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ। নিশ্চত হবে 'সবার জন্য ডাল ভাতের' অধিকার।

আমরা চাই একটি সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তিপূর্ণ সমাজ। দুর্নীতির রাহুগ্রাসমুক্ত একটি স্বনির্ভর, সুখী, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের এই অঙ্গীকার পূরণে আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসির দোয়া এবং সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করি।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সন্ত্রাসমুক্ত জীবন যাপন করতে, দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতিহীন, সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে , নিজ নিজ ধর্মকর্ম নির্ভয়ে পালন করতে, এক কথায় পচনশীল সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে, আমরা বিশ্বাস করা, আগামী নির্বাচনে আমরা দেশবাসীকে আমাদের সাথী হিসেবে পাব। বিগত পাঁচ বছরে জাতিকে যে অন্ধকারে নিপতিত করা হয়েছে তা থেকে উত্তোরণের পথ আমাদের অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে। তবে সেজন্য আমাদের নিজেদেরকেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্'তাআলা আমাদেরকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন: "ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়্যেরু মা বি কাওমিন, হাত্তা ইউগাইয়্যেরু মা বি আনফুসিহিম"- আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সেই জাতি নিজের অবস্থা নিজেই পরিবর্তন করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ'তাআলা আমাদেরকে দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধনের তৌফিক দিন।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ – জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল – জিন্দাবাদ।